# স্মৃতিসরণি

## স্বামী দেবেশানন্দ

[লেখকের এই স্মৃতিচারণটি শ্রীমৎ স্বামী ধীরেশানন্দজী মহারাজ তাঁর ডায়েরিতে লিপিবদ্ধ করে রেখেছিলেন, যেটি সংগ্রহ করে নিবোধত-কে দিয়েছেন পূজনীয় স্বামী চেতনানন্দ, অধ্যক্ষ, সেন্ট লুইস বেদান্তকেন্দ্র, আমেরিকা।]

কনখলে স্বামীজীর শিষ্য স্বামী কল্যাণানন্দ 'বড় স্বামী' এবং স্বামী নিশ্চয়ানন্দ 'ছোট স্বামী' বলে পরিচিত ছিলেন। ছোট স্বামী খুব স্পষ্টবাদী ছিলেন। অপরেরও স্পষ্টবাদিতা পছন্দ করতেন। অনেকে স্পষ্টকথা বলে যাদের নাম, ক্ষমতা, প্রতিষ্ঠা আছে; কিন্তু অপরের স্পষ্টকথা সহ্য করতে পারে না। ছোট স্বামী তেমন ছিলেন না। একদিন কী একটা ভুল বোঝাবুঝির ফলে তিনি চটে গিয়ে আমায় কী বলেছেন। আমিও দুকথা শুনিয়ে দিলুম। ছোট স্বামী চুপ করে শুনলেন। তারপর বললেন, ''তা বেশ, আমিও তোমাকে যা বলার বললাম, আর তুমিও আমাকে যা বলার বললে। আমিও তোমাকে বুঝে নিলুম, তুমিও আমাকে বুঝে নিলে। তবে সেসব কথা মনে রাখতে হবে কেন? মনে রাখতে হবে এক ভগবানকে।''

রাজা মহারাজ কনখল সেবাশ্রমে প্রথম আসছেন। তখন সামনের জমি হয়নি। মাঝের জমিতেই ঝুপড়ি বেঁধে বড় ও ছোট স্বামী থাকেন। বর্ষায় জল পড়ে। তাই তাঁরা মহারাজের থাকার জন্য চেতনদেবের কুঠিয়ায় একটি ঘর ঠিক করেন। কিন্তু মহারাজ এসে ওই ঝুপড়িতেই থাকা স্থির করেন। কারণ সেটি নিজেদের জায়গা—ঠাকুরের স্থান। ঘাসটাস দিয়ে সেই ঝুপড়িই একটু ঠিক করে নিলেন তাঁরা। মহারাজ সেখানে রইলেন। ছোট স্বামী লাঠি-হাতে পিছনের জঙ্গলে রাত্রে বসে পাহারা দিতেন। তখন জংলি সব জানোয়ার সময়ে সময়ে আসত। মহারাজের যাতে কোনও অসুবিধা না হয় তার জন্য তাঁরা সদা সচেষ্ট ছিলেন। ঠিক যেন লক্ষ্মণের মতো সেবা করতেন।

কাশীতে হরি মহারাজের খুব অসুখ শুনে ছোট স্বামী হঠাৎ সন্ধ্যাবেলায় খেয়ে হরিদ্বার স্টেশনে চলে গেলেন, বিছানা বা জামাকাপড় কিছু নিলেন না। অনুভবানন্দ প্রভৃতি সঙ্গে ছিল। লক্ষ্ণৌতে সকালে গাড়ি পৌঁছলে ওরা কিছু খাওয়ার উদ্যোগ করল। ছোট স্বামীকে দিতে এলে তিনি কিছু খেলেন না। বললেন, ''আরে তোমরা ছেলেমানুষ, তোমরা খাও। আমি হরি মহারাজকে দর্শন করতে যাচ্ছি, তাঁকে দর্শন করে তবে খাব।'' বিকেল পর্যন্ত জলটুকুও খেলেন না। কাশী গিয়ে হরি মহারাজকে প্রণাম করতেই তিনি বললেন, ''আরে কে! এ যে অচল বিগ্রহ সচল হয়ে উঠেছে দেখছি!''

একদিন হরি মহারাজের ব্যাধি নিরাময়ের

উদ্দেশ্যে দুর্গাবাড়িতে বলি সহ পূজা দেওয়া হল। প্রিয় মহারাজ হরি মহারাজকে বললেন ছোট স্বামীকে মাংস প্রসাদ গ্রহণ করতে বলতে। হরি মহারাজ বলাতে তিনি খেলেন। পরে, খেতে কেমন লাগল জিজ্ঞাসা করায় তিনি বললেন, ''রাঁধতে পারেনি ঠিক করে।'' নুনের বদলে ভুলে চিনি দেওয়া হয়েছিল। মিষ্টি মিষ্টি—খেতে ভাল হয়নি।

ওকাকুরা জাপান থেকে কয়েক হাজার টাকার জিনিস উপহার নিয়ে বেলুড় মঠে এসেছেন স্বামীজীকে জাপানে নিয়ে যাবেন বলে। ওকাকুরা ভেবেছিলেন স্বামীজী জিনিস পেয়ে খুশি হয়ে জাপানে যাবেন। স্বামীজী কিন্তু 'সেপাই'কে অর্থাৎ নিশ্চয়ানন্দকে ডেকে হুকুম দেন, ''এই সেপাই, যা তো এই জিনিসগুলো গঙ্গায় ফেলে দে।'' ''জো হুকুম'' বলে তিনি সেগুলি নিয়ে গঙ্গায় চললেন। নিচে শরৎ মহারাজ দেখে বললেন সেগুলি রেখে দিতে। ছোট স্বামী বললেন, ''ইয়ে নেহি হো সকতা। আপ জাইয়ে, হুকুম cancel কীজিয়ে, নেহি ত হম জরুর ফেক দেঙ্গে।'' শরৎ মহারাজের কথায় স্বামীজী নির্দেশ দিলেন, ''ওর জিনিস ও নিয়ে যাক, নতুবা গঙ্গায় যাবে।''

ছোট স্বামী গিরিশ ঘোষের বাড়ি গিয়েছেন। লাটু মহারাজ সেখানে এলেন। গিরিশবাবু লাটু মহারাজকে বললেন, ''এই দেখো, এটি স্বামীজীর এক সেপাই চেলা।'' লাটু মহারাজ বললেন, ''আরে সব হুজুগ! ছোঁড়া লোক পেলে না—শেষে কিনা স্বামীজীকে গুরু বানালে?... কি এমন দেখলে তাঁর মধ্যে?'' ছোট স্বামী খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে চটে গিয়ে বললেন, ''আপ কিসকো গুরু বনায়া? আপনে গলতি কিয়া জো স্বামীজীকো গুরু নেহি বনায়া।'' গিরিশবাবু হাসছেন। পরে লাটু মহারাজের পরিচয় করিয়ে দিলেন। ছোট স্বামী তখন লাটু মহারাজকে প্রণাম করলেন। লাটু মহারাজ খুশি হলেন—গুরুর যোগ্য চেলাই বটে! ছোট স্বামী বলতেন যে লাটু মহারাজ পরীক্ষা করার জন্য কখনও কখনও এমন করতেন।

নিজের সাধু হওয়ার কথায় ছোট স্বামী বলতেন, ''পিঠে বন্দুক নিয়ে মাদ্রাজ শহরে ঘুরে বেড়াচ্ছি আর দেখছি প্রতি বাড়ির সামনে প্রদীপ জ্বালা হয়েছে—স্বামীজী দিগ্‌বিজয় করে আসছেন বলে। রাত তিনটে অবধি ঘুরে ঘুরে ঘরে ফিরলাম। পরদিন স্বামীজীর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। ১০টা থেকে ৫টা পর্যন্ত অপেক্ষা করছি। কত লোক দেখা করে ফিরে যাচ্ছে। পরে আমার ডাক পড়ল। তখন দর্শন হল।'' কী কথা হয়েছিল তা আর তিনি বলেননি। তবে স্বামীজীর সেই দর্শনের কথা বলতে গিয়ে ছোট স্বামীর চোখমুখ লাল হয়ে উঠত।

মঠে স্বামীজীর শরীর খারাপ। বরানগর থেকে টিউবওয়েলের এক কুঁজো জল ছোট স্বামী রোজ নিয়ে আসেন স্বামীজীর জন্য। একদিন জলভরা কুঁজো নিয়ে তিনি মঠে ঢুকছেন, তখন স্বামীজীর এক পাশ্চাত্য শিষ্যা তাঁকে বললেন, ''আচ্ছা, কেন আপনি জল তোলার জন্য একজন চাকর রাখেন না?'' ছোট স্বামী চটে গিয়ে বললেন, ''You are a foolish lady.'' মেমসাহেবের তো মুখ লাল হয়ে উঠল। স্বামীজীর কাছে নালিশ করলেন, ''আমি কী ভুল করেছি যার জন্য ওই সন্ন্যাসী আমাকে বোকা বললেন?'' স্বামীজী সব শুনে বললেন, ''এটা ইন্ডিয়া। গুরুসেবা এখানে প্রধান ধর্ম। তুমি ওকে অমন বললে কেন? তাই তো সে তোমাকে অমন বলেছে।'' তারপর স্বামীজী তাকে ছোট স্বামীর কাছে ক্ষমা চাইতে বললেন। মেম কাঁদতে কাঁদতে ক্ষমা চাইতে গেল। ছোট স্বামী তখন কৌপীনমাত্র পরে বুড়ো গোপালদার বাগান কোদলাচ্ছেন। মেমকে দেখে কোথায় লুকোবেন ঠিক করতে পারছেন না। মেম ক্ষমা চাওয়াতে বললেন, ''হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি তোমাকে ক্ষমা করেছি। তুমি এখন যেতে পারো।''

বড় কানাই মহারাজের (স্বামী নির্ভয়ানন্দ) সঙ্গে ছোট স্বামী পাঞ্জাব প্লেগ রিলিফে যান। হেঁটে হেঁটে বহুদূর গিয়েছেন, বেলা পড়ে গেছে তবু গন্তব্য-স্থলের পাত্তা নেই। কানাই মহারাজ বললেন, ''ভাই, বিকেল হয়ে এল। চলো একটা থাকার জায়গা ও খাবার ব্যবস্থা করা যাক।'' ছোট স্বামী বললেন, ''কোথায় খাব কোথায় থাকব—এই যদি ভাবনা থাকে তবে কেন সাধু হলে?'' কানাই মহারাজ পরে রহস্য করে বলতেন, ''মনে আছে—কোথায় খাব কোথায় থাকব—তবে কেন সাধু হলে?''

একবার কনখল সেবাশ্রমে কালীপূজা। বড় স্বামীর (কল্যাণানন্দজী) ইচ্ছা পাঁঠাবলি হয়; তবে ছোট স্বামী যেন না জানতে পারেন। ছোট স্বামী রাত এগারোটা-বারোটা অবধি পূজা দেখে শুতে গেলেন। সহজানন্দ, উমেশ ও আমি (প্রভাস—দেবেশানন্দ) কলাবাগানে কলাগাছকে হাঁড়িকাঠ বানিয়ে পাঁঠাবলি দিলাম। দেবীকে মাথা ও রক্ত নিবেদন করা হল। তারপর রান্না হল। রাত তিনটেয় উঠে ছোট স্বামী পূজা দেখে—''এখনও পূজা শেষ হল না কেন'' বলে নিজের ঘরে চলে গেলেন। সব টের পেয়েছেন। ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়লেন। আর উঠছেন না। পরদিন দুপুরেও উঠলেন না। কারও ডাকে এলেন না। শেষে বড় স্বামী ডাকতে গেলে চটে একেবারে আউটবার্স্ট : ''তুমি বুড়ো হয়েছ। লেড়কাদের সঙ্গে মিশে এসব করছ?''

বড় স্বামী চুপ করে দাঁড়িয়ে। আমরাও এদিক ওদিক চুপ করে আছি। ছোট স্বামী সারাদিন খেলেন না। সন্ধ্যায় আমি গিয়ে বললাম, ''মহারাজ, সারাদিন তো কিছু খাননি। খিচুড়ি বানিয়ে দেব?'' একটু চুপ করে থেকে বললেন, ''আচ্ছা, বানাও।'' তাই খেলেন। আমায় খুব ভালবাসতেন। গা-হাত-পা টিপে দিতুম। সন্ধ্যায় তামাক সেজে দিতুম। তখন কত কথা শুনতুম।

ছোট স্বামী লেনিয়েন্টও ছিলেন। বড় স্বামীর পিঠে কার্বাঙ্কল আবার এদিকে ডায়াবিটিস। সিভিল সার্জেন বললে, একটু চিকেন স্যুপ দিলে ভাল হয়। আমি বললুম, ''যদি চিকেন আনিয়ে দিতে পারেন তো আমি স্যুপ তৈরি করে দেব।'' মোরদা আলিকে দিয়ে একদিন বাদে বাদে ছোট স্বামী মুরগি আনিয়ে দিতেন। দুর্গানন্দ স্বামীর ঘরে আমি থাকতুম, সেখানে বানাতুম। স্যুপটা বড় স্বামী কিছু রাতে ও কিছু পরদিন খেতেন।

কনখলে তখন চারদিকে জঙ্গল। এক রাত্রে বুনো হাতি এল। ঝুপড়ি ভাঙল না, পাশ দিয়ে চলে গেল। ছোট স্বামী একটা গাছের পিছনে লুকিয়ে ছিলেন।

সেবাশ্রমে আলমারি ছিল না। প্যাকিং বক্সগুলোকে পিটিয়ে-পুটিয়ে তাতে ঔষধ রাখা হত। একদিন বাঁদর এসে সব ঔষধ ফেলে নষ্ট করেছে। কল্যাণ মহারাজ ও নিশ্চয় মহারাজ সেগুলি আবার গুছিয়ে রাখছেন। এমন সময় মঙ্গলগিরি এসে বললেন, ''কেয়া মহাত্মা, কেয়া হোতা হ্যায়?'' বাঁদরে ঔষধ ফেলে দিয়েছে শুনে বললেন, ''কেন, তোমাদের আলমারি নেই?'' ''খাবারই জোটে না তো আলমারি!''—এই জবাব পেয়ে বললেন, ''আচ্ছা, আমি একটা আলমারি দেব।'' তিনি কাউকে বলে একটা আলমারি দেওয়ালেন। সেই হল ফার্স্ট গিফ্‌ট।

একদিন দুটি রোগী মারা গেল। বারবার কে মড়া নিয়ে যাবে বলে দুটোকে একসঙ্গে বেঁধে বাঁশে করে বড় ও ছোট স্বামী নীলধারায় ফেলে দিয়ে এলেন। মাঝরাস্তায় বড় স্বামী পিছলে পড়ে যান। খুব কষ্ট হয়েছিল।

ব্রহ্মজ্ঞ মথুরাদাসের কথা মনে পড়ে। তাঁর কী চমৎকার ব্রহ্মাবগাহী বৃত্তি ছিল! নিশ্চলদাসের 'বিচারসাগর' গ্রন্থখানি খুব মুখস্থ ছিল। সতীকুণ্ডের এক গাছতলায় বসে থাকার সময় তাঁর গায়ে একটা

সাপ উঠেছিল কিন্তু ঘাবড়াননি। জিজ্ঞাসা করলে বলেছিলেন, ''কেন ঘাবড়াব? আমি তাকে ভয় পাই না। সেও আমাকে ভয় পায় না। এসেছিল, আবার চলে গেল।''

মথুরাদাস সতীকুণ্ডের মন্দিরের নিচে থাকতেন। গ্রামে মাধুকরী করতেন। প্রতি বাড়িতে একখানির বেশি রুটি নিতেন না। যেতে যেতে খেতেন। খেয়ে গায়ে হাত মুছে আবার অন্য বাড়িতে যেতেন। কেউ খাওয়ার পর জল দিতে চাইলে বলতেন, ''না, জল তো গঙ্গাজীতে আছে। সেজন্য তোমার কাছে আসিনি। তোমার কাছে রুটির জন্য এসেছি।'' যত কম প্রতিগ্রহ করা যায়—এই ভাব ছিল।

চণ্ডীপাহাড় থেকে নামার সময় মথুরাদাস ল্যান্ড স্লাইড হওয়াতে উপর থেকে গড়িয়ে নিচে পড়ে যান। গঙ্গার ধারে দুদিন অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন। দুই পায়ে জানুর উপর খুব লেগে পেকে ফুলে পুঁজ হয়ে যায়। আমরা কদিন খবর পাইনি। পরে স্টেশনের পিছনের জঙ্গলে এক বাগানে পড়ে আছেন শুনে গেলাম। যদি আসতে না চান তাই নিশ্চয় স্বামীকে বলে চাকু নিয়ে গিয়েছি—দরকার হলে ওখানেই অপারেশন করব। আমাকে দেখেই বললেন, ''কিঁউ আয়া?'' আমি বললুম, ''ইয়ে তুমারা বাপকা জগহ হ্যায়? তুম কৈসে আয়া? হামভি ঐসেহী আয়া।'' ''যা, চল যা।'' ''পহলে তো ইয়ে খাও।'' কমলালেবু নিয়ে গিয়েছিলাম। তিনি খেলেন। বললুম, ''আভি চলো সেবাশ্রমমে।'' ''নেহি জাউঙ্গা।'' ''উঠাকে লে জায়েঙ্গে, তব তো জাওগে না?'' ''উঠাকে লে জায়েগা তো জাউঙ্গা।'' তখন আমার গায়ে জোর ছিল। চ্যাংদোলা করে নিয়ে টাঙায় তুললাম। সেবাশ্রমে তখন ডা. ভবানীবাবু ছিলেন। তিনি ছ-ইঞ্চি লম্বা দুটো জায়গা চিরে বহু রক্ত-পুঁজ বের করলেন। মথুরাদাস শুয়ে আছেন—যেন আর কারও শরীর কাটা হচ্ছে। আমি ব্যান্ডেজ করছি। ঘায়ে আয়োডিন দিয়েছি। তখন তাই করা হত। বললাম, ''কেয়া বাবাজী, আভি ক্যায়সা মালুম হোতা হ্যায়?'' তিনি বললেন, ''কেয়া হ্যায়? ঔর কাটনা হ্যায় তো ঔর কাট লে।'' মুখে এতটুকু বিকৃতি নেই। তিতিক্ষার পরাকাষ্ঠা।

বিল্বকেশ্বরে একদিন জঙ্গলে বসে আছেন। সামনে দিয়ে এক বাঘ চলে গেল। দূরে এক সাধু বসেছিল। সেই সাধু বা বাঘ কেউ কাউকে দেখেনি। সাধুর কাশির শব্দ শুনে বাঘ হুঁম শব্দ করে সাধুর উপর দিয়ে এক লাফে চলে গেল। সাধু তো ভয়ে দে দৌড়। মথুরাদাসের সামনে এলে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, ''আরে কেয়া হুয়া?'' সাধু বললেন, ''শের গয়া।'' ''আরে ও তো আমার সামনে দিয়েও গেল। তুমি কেন ভয় পাচ্ছ?'' ''আপনি থাকুন। আমি তো পালাচ্ছি।''

''তোমার ভয় করেনি?''—জিজ্ঞাসার উত্তরে মথুরাদাস বলেছিলেন, ''ডর কেয়া? আমিও ওকে ভয় পাই না, ও-ও আমায় ভয় পায় না।'' নির্ভীক পুরুষ ছিলেন।

শীতকাল। একদিন ক্যানাল ব্রিজের উপর দাঁড়িয়ে আছি। পিছন থেকে মথুরানাথ আমায় জাপটে ধরেছেন। আমি বললুম, ''ছোড়ো বাবাজী। নেহি তো তুমকো নহরমে ফেক দেঙ্গে।'' বললেন, ''আরে অব তো তু হার গয়া।'' জিজ্ঞাসা করলাম : ''বাবাজী, এই দারুণ শীত, বৃষ্টি হয়েছে, কনকনে হাওয়া। তুমি তো নগ্ন। শীত লাগে না? আমি তো গরম জামাকাপড় গায়ে দিয়েছি।'' মথুরাদাস বললেন, ''নেহি, অন্দর গরম হ্যায়।'' শীতগ্রীষ্ম সর্বদা তাঁর একভাব ছিল। সোজা হয়ে চলতেন। স্নানের বালাই নেই। বৃষ্টিতে ভিজে যা স্নান হত। ''গায়ে গন্ধ হয় না?''—একদিন জিজ্ঞাসা করাতে হাত উঠিয়ে বাহুর নিচ দেখিয়ে বললেন, ''নেহি, এই দেখ, সুঁখলে।'' সত্যি তাঁর গায়ে গন্ধ ছিল না।

মথুরাদাস বলতেন, ''ছেলেবেলায় ঘর ছেড়ে চলে এলাম। কাপড় যখন ছিঁড়ে গেল তখন কারও

কাছে চাইলাম। সে উপেক্ষা করাতে ধিক্কার এল। সব ছেড়ে এলাম, শেষে কাপড়ের জন্য পরের উপেক্ষা সহ্য করতে হবে? যা ছিল সব ফেলে দিলাম। এক কৌপীনেই ঘুরতে লাগলাম। সেই অবধি অভ্যাস হয়ে গেছে। তুই কিন্তু আমার দেখাদেখি অমন করিস না। তোদের এই ভাল। সাধুসেবা করছিস, ভজনও করছিস—এই ভাল।"

একদিন একটা বড় বেল নিয়ে মথুরাদাস সেবাশ্রমে হাজির। আমাকে বললেন, ''এই লে, খা।" বললুম, ''বাবাজী, শরবৎ বানাব—খাবে?" ''হাঁ, লে আ।" আমি তাঁকে বসতে বলে বেলের শরবৎ নিয়ে এসে দেখি তিনি চলে গেছেন। দুপুরে খাওয়ার পর সেই শরবৎ নিয়ে সতীকুণ্ডে গিয়ে দেখি গাছতলায় শুয়ে আছেন। বললুম, ''তুম তো বড়া ঝুঠা আদমী হো! হাম শরবৎ বানানেকো গিয়া ঔর তুম ইধর ভাগ গিয়া?" ''কেয়া হুয়া? আভি লে আয়া? আচ্ছা দে।" শরবৎ দিলাম। তিনি খেলেন। কেমন হয়েছে জিজ্ঞাসা করায় বললেন, ''আচ্ছা হুয়া।" বালকের মতো ছিলেন।

মথুরাদাস আমায় বলেছিলেন, জঙ্গলে একরকম পাতা ও পিঁয়াজের মতো জিনিস আছে। ওই পাতা খেলে ও ওই গোল পিঁয়াজের মতো জিনিসটা পুড়িয়ে খেলে অনেকদিন শরীরে বেশ পুষ্টি থাকে, ক্ষুধার জন্য কষ্ট হয় না। আমাকে দেখিয়ে দেবেন বলেছিলেন, তা আর দেখা হয়নি। একদিন মথুরাদাস বিল্বকেশ্বরের জঙ্গলে যাচ্ছেন। মনীষানন্দ তাঁর পিছু নিল। মানা করাতেও বরিশালের বাঙাল পিছু ছাড়ে না। শেষে মথুরানাথ পাথর ছুঁড়তে আরম্ভ করায় সে পালিয়ে এল। পরদিন মথুরাদাস আমায় বললেন, ''আরে, তেরা ব্রহ্মচারী কাল ক্যায়সা পাত্থর খায়া পুছনা।" মনীষানন্দকে জিজ্ঞাসা করায় বলতে চায় না, শেষটা স্বীকার করল।

বৈকুণ্ঠানন্দ তখন ব্রহ্মচারী, এক শীতের রাত্রে একখানা কম্বল নিয়ে মথুরাদাসের সতীকুণ্ডের কুঠিয়ায় থাকতে গেছে। মথুরাদাস তো খড়ের উপর এমনি পড়ে আছেন। সেও তাই থাকবে—এমন ইচ্ছা। রাত্রে ঘুমের ঘোরে কখন কম্বল টেনে গায়ে জড়িয়ে ঘুমুচ্ছে। ভোর হলে মথুরাদাস ডাকলেন, ''এ ব্রহ্মচারী উঠ। হিঁয়াসে ভাগ যা।" পরদিন মথুরাদাস আমায় বললেন, ''কেয়া, তেরা ব্রহ্মচারীকা কাল রাতমে কম্বলকা কেয়া হুয়া থা?" পরে সব প্রকাশ পেল।

মঙ্গলগিরি খুব বেদান্তী। পায়ে ঘা, স্বামী নিশ্চয়ানন্দের কাছে বসে আছেন। আমাকে বললেন, ''এই ব্রহ্মচারী, এই দেখ পায়ে কী হয়েছে। মলম পট্টি করে দে।" ''আইয়ে মহারাজ"—বলে আমি তাঁকে ব্যান্ডেজ করে দিচ্ছি। ইচ্ছা করেই ঘায়ে একটু খোঁচা দিলাম। ''উহুঃ" করে উঠতেই আমি বললুম, ''কেয়া হ্যায় মহারাজ! ইয়ে তো শরীরকা ভোগ হ্যায়। আপ তো আত্মা হ্যায়। আপকা কেয়া হ্যায়?" তিনি বুঝলেন আমার দুষ্টুমি। বললেন, ''হাম সমঝ গিয়া। তু শয়তান হ্যায়। আরে আভি তো হম বুঢ্ঢা হো গিয়া। দাঁত নেহি হ্যায়। নরম নরম ঘিওয়ালী ফুলকা, দুধ চাহিয়ে। বেদান্তকী বাত না করে তো কৌন হমকো খানেকো দেগা। নরম গদিভী চাহিয়ে। তেরা কেয়া হ্যায়। তু তো জোয়ান তাকরা হ্যায়। দেখনেমে ভী আচ্ছা হ্যায়। সব চীজ তেরা পাশ দৌড়কে আয়েগা।" মঙ্গলগিরি স্পষ্টবাদী সাচ্চা লোক ছিলেন।

নিবৃত্তিনাথজী খুব তিতিক্ষু সন্ন্যাসী ছিলেন। উত্তরকাশী থেকে আমাদের সেবাশ্রমে এসে পক্স-এ কাতর। খুব কষ্ট। 'শিবোঽহং শিবোঽহং' করছেন। আমায় দেখে বললেন, ''বড় কষ্ট হচ্ছে।" দু-তিন দিন পর কষ্ট কমে গেল।

একবার এক রমতা সাধু কলেরা হয়ে কনখল সেবাশ্রমে এল। শুয়ে সে কিছুতেই বেড প্যান ব্যবহার করবে না। তাকে বসিয়ে দিতে হবে। দুদিন গেল। তৃতীয় দিন সকালে সে একেবারে নেতিয়ে

পড়েছে। বারবার বলছে—আমাকে বসিয়ে দাও। অনেক বলাতে নিচে একটা আসন করে বসিয়ে দিলাম ঠেস দেওয়ার ব্যবস্থা করে। মিনিট দুই ''শিবোঽহং শিবোঽহং' বলতে বলতে এলিয়ে পড়ল। শরীর ছেড়ে দিল। ছোট স্বামী বললেন, ''হ্যাঁ, উনি অমন সাধুই বটে।'' ছোট স্বামী তাঁকে চিনতেন। ওই সাধুর মৃত্যুর খবর পেয়ে সব মোহান্ত ও মণ্ডলেশ্বররা দর্শন করতে এলেন। প্রসেশন ও বাদ্যভাণ্ড নিয়ে নীলধারায় তাঁর দেহ বিসর্জন দেওয়া হল। তখন বুঝলাম তিনি নামকরা সাধু ছিলেন। সকলে তাঁকে জানত, বলত 'পৌঁছে হুয়ে মহাত্মা।'

শুনেছি নাগারা লাল তুলসীর শিকড় বেটে, ঘষে বা এমনি চিবিয়ে খায়। তাতে দু-তিন দিন খিদে পায় না, শরীরও দুর্বল হয় না, অনাহারে ক্ষতি হয় না।

মনে পড়ে যাদবানন্দকে। শরৎ মহারাজ বললেন, ''ছক্কু (যাদবানন্দ), গোবিন্দের পক্স হয়েছে। হাসপাতালে আছে। শেষে কি ডোমে ওকে টেনে ফেলবে?'' ছক্কু বলল, ''কেন মহারাজ, আমি রয়েছি। আমি সেবা করব।'' ছক্কু গিয়ে খুব সেবা করল। শরৎ মহারাজের চোখে জল। তিনি বললেন, ''দেখলে ওর প্রাণটা! নিজের প্রাণের মায়া করলে না!'' অনেক বলাতে শরৎ মহারাজের কথায় ছক্কু একটা অ্যান্টিপক্স ইনজেকশন নিল।

উদ্বোধনের পাশের বস্তিতে রাত্রে বড় গোলমাল হয়। শ্রীমার ঘুম হয় না। বস্তির লোকদের বললেও শোনে না। শরৎ মহারাজ ছক্কুকে জিজ্ঞাসা করলেন কী করা যায়। সে গিয়ে গালাগাল করে খাপরার ঘরের উপর তিন-চারটে ইট ছুঁড়ে মারল। খাপরা ভেঙে চুরমার। লোকেরা হইহই করাতে ছক্কু শাসিয়ে বলল, ''আবার গোলমাল করবে তো ঘরে আগুন লাগিয়ে দেব।'' ব্যস, সেদিন থেকে সব গোলমাল বন্ধ।

ছক্কু উদ্বোধনে একটা বিড়ালের লেজ কেটে দিয়েছে। গোলাপ মা শ্রীমাকে বলে দিলেন। প্রণাম করতে গেলে মা ছক্কুকে বলেন, ''বেড়ালটার লেজ কেটে দিয়েছিস কেন? তুই কি সারাদিন কেবল উপদ্রবই করবি? একটুও স্থির হয়ে বসবি না?''

স্বামীজী মঠে পূজা করছেন। শশী মহারাজ নিচে। স্বামীজী নিচে এলে দুজনে কী একটা বিষয় নিয়ে ঝগড়া। হাতাহাতি হয় হয়। পাছে মারামারি হয় এই ভয়ে কানাই মহারাজ স্বামীজীকে জাপটে ধরেছেন বেশ জোরে। স্বামীজী বললেন, ''আরে ছাড়, ছাড়।'' স্বামীজীর হাতে লাল হয়ে দাগ পড়ে গেছে। কানাই মহারাজ সরে পড়েছেন। স্বামীজী বলছেন, ''শশী, এই দেখ তোর চেলা আমায় এমন ধরেছে, আমার হাত লাল হয়ে গেছে।''

শশী মহারাজ বললেন, ''তাইতো, কোথায় গেল শালা। মহাপুরুষকে এমনি করে ধরেছে? ওর নরকেও গতি হবে না। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবও ওকে রক্ষা করতে পারবে না।'' কানাই মহারাজ অবাক! এই এত ঝগড়া; আবার পরমুহূর্তেই হরিহরাত্মা। কানাই মহারাজ দুজনের কাছেই ক্ষমা চাইলেন।

কলকাতা থেকে স্বামীজী আসছেন। কানাই মহারাজ সঙ্গে। রাস্তায় এক খাবারের দোকান থেকে আলুর দমের সুন্দর গন্ধ আসছে। স্বামীজী বলছেন, ''ওরে কানাই, কেন্ কেন্ আলুর দম। কী সুন্দর গন্ধ!'' খানিকটা কেনা হল। একটা শালপাতার ঠোঙায় আলুর দম নিয়ে স্বামীজী খেতে খেতে চলেছেন, বলছেন, ''বাঃ, কী চমৎকার হয়েছে!'' নৌকা থেকে মঠে নামতেই রাজা মহারাজকে দেখে স্বামীজী বললেন, ''এই রাজা, কী সুন্দর আলুর দম খেলুম। কানাই, দে দে রাজাকে আলুর দম দে।'' কানাই মহারাজ স্বামীজীর ব্যাপার জানতেন, তাই খানিকটা রেখে দিয়েছিলেন চুপড়িতে। তা থেকে রাজা মহারাজকে দিলেন। স্বামীজী ভারি খুশি। বললেন, ''কেনোটা বেশ বোঝে।''